আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাভার

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

আয়োজনে
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা
অধ্যাপক মফিজুর রহমান
চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আহ্বায়ক
রোবায়েত ফেরদৌস

সদস্য
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
ফাহমিদুল হক
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
শাওন্তী হায়দার

সম্পাদক
ফাহমিদুল হক

Ataus Samad Memorial Trust
University of Dhaka
Lifetime Achievement Award, Memorial Lecture and Student Scholarship Programme, 2015
Organized by Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka 1000.

আজীবন সম্মাননা
তোয়াব খান

স্মারক বক্তা
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম

স্মারক বক্তৃতা

আতাউস সামাদ: এক কৃতিমান সাংবাদিক

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম

শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি একদিকে নান্দনিক ও সৃজনশীল অন্যদিকে চ্যালেঞ্জিং যে পেশাটির কথা আমাদের সামনে ভেসে উঠে সেটি হচ্ছে সাংবাদিকতা। এই উপমহাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাস অনেক পুরনো – অনেক বিস্তৃত। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার শেকড় অবিভক্ত ভারতবর্ষ অতঃপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকতার ইতিহাসের গর্ভে প্রোথিত। তারপরও বাংলাদেশের সাংবাদিকতার একটি স্বতন্ত্র দিক রয়েছে, একটি চিহ্নিত ধারা রয়েছে।

এদেশে মুদ্রণ সাংবাদিকতা বহু আগে থেকে শুরু হলেও ইলেক্ট্রনিক সাংবাদিকতা, বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকতার শুরু ১৯৬০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তবে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক উভয় মিডিয়ার প্রকৃতি এবং কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে মূলত গত দেড়/দুই দশক বা তার সামান্য কিছু বেশি সময় ধরে। বলা যায় এসময়ে এসে সাংবাদিকতা শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। সাংবাদিকতার এখন বহু আঙ্গিক, নানা মাত্রিকতা, ব্যাপক বিস্তৃতি এবং বিশাল অর্থনীতি রয়েছে। এই শিল্পে এখন একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানও ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকতার নতুন ধারা – সোশ্যাল বা অনলাইন মিডিয়া এখন যেন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে এক করে ফেলেছে। গণমাধ্যমের নিয়ত পরিবর্তনশীলতাকে ধারণ করেই বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্রমপ্রসারমানতার যাত্রায় সাংবাদিকতা পেশার বর্তমান মানুষগুলো ছাড়াও ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন এমন বহু মানুষের ছোঁয়া এবং তাঁদের অপরিমেয় অবদান রয়েছে। এদেশে সাংবাদিকতা পেশায় যাঁরা পথিকৃত তাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত। বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে তাঁরা ছিলেন এক একটি উজ্জ্বল আলোঘর। এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন বরেণ্য, খ্যাতিমান, অদম্য কর্মী এবং নিবেদিতপ্রাণ-

সাহসী সাংবাদিক। এখানে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য জানিয়ে রাখি যে, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে যাঁরা সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থেকে শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এদেশের সাংবাদিকতাকে আজকের উজ্জ্বল অবস্থানে নিয়ে এসেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন – মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমেদ, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আব্দুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, ওবায়েদ-উল হক, সন্তোষ গুপ্ত, সানাউল্লাহ নূরী, কে জি মোস্তফা, বজলুর রহমান, এ বি এম মূসা, নির্মল সেন, আতাউস সামাদ, খোন্দকার আলী আশরাফ, সেলিনা পারভীন, মোনাজাত উদ্দিন প্রমুখ অগণিত নাম। এঁরা সবাই এখন প্রয়াত। তাঁরা নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য সত্যিই যেন এক আলোর ভুবনের ভিত তৈরী করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন প্রয়াত সাংবাদিক আতাউস সামাদ। আতাউস সামাদরাই তাঁদের প্রতিভা, পেশাগত প্রয়াস, উৎকর্ষ এবং দক্ষ সৃষ্টিকর্ম দিয়ে আমাদেরকে কুপিবাতি জ্বালানোর চেষ্টা নিতে শিখিয়ে গেছেন। আমি আজকের প্রবন্ধে প্রয়াত আতাউস সামাদ এবং তাঁর লেখালেখির কিছু দিক নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

আতাউস সামাদের থেকে বয়সে ৬/৭ বছরের বড় এদেশের সাংবাদিকতা জগতের আর এক কৃতিপুরুষের নাম এবিএম মূসা। এবিএম মূসাও আজ প্রয়াত। আতাউস সামাদের মৃত্যুর পর এবিএম মূসা তাঁর অনুজ সহকর্মী আতাউস সামাদের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে 'আতাউস সামাদ ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই ফান্ডের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহায়তায় আজকের এই বক্তৃতা, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আমি শুরুতেই মরহুম আতাউস সামাদ ও মরহুম এ বি এম মূসার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং এই মহতি একটি আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে আতাউস সামাদ ট্রাস্ট ফান্ডের প্রথম এই অনুষ্ঠানে বক্তা নির্বাচন করায় আমি আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গণমাধ্যমের পাঠক-শ্রোতা-দর্শক হিসেবে আমরা সবাই সব সময় তথ্য পেতে চাই। সংবাদ জানা কিংবা ঘটনার বিশ্লেষণ তথা পর্যালোচনা শোনার জন্য আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি থাকে না। কিন্তু ঘটনাকে খবর হিসেবে পাঠক-শ্রোতার সামনে নিয়ে আসেন যাঁরা অর্থাৎ সাংবাদিকতা প্রক্রিয়ার নেপথ্যে যে মানুষগুলো কাজ করেন তাঁরা অনেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যান। তাঁদের কর্মকাণ্ড আর নিরলস প্রচেষ্টায় যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইতিহাসে বিধৃত হলেও এর পেছনের মানুষগুলো নিজেরা যেন ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। আমরা অনেকেই তখন আর তাঁদের কথা মনে রাখি না বা তাঁদের কর্ম সম্পর্কে ভুলে

যাই; তাঁদের সম্পর্কে তেমন একটা জানতেও চাই না। এ ব্যাপারে এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান বলেছিলেন – 'আজকের দিনের তরুণ সমাজ দেশের বরেণ্য সাংবাদিক আব্দুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কিংবা জহুর হোসেন চৌধুরী সম্পর্কেও কম জানে। এমনকি তরুণ সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এসব গুণী সাংবাদিকের নামের বাইরে তাঁদের অনন্য কর্মময় জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়'। আজকে যাঁর নামে ট্রাস্ট ফান্ড, সেই আতাউস সামাদ এবং যিনি এই ফান্ডটি গঠনের উদ্যোগী পুরুষ, এ বি এম মূসা বছর কয়েক হলো মাত্র প্রয়াত হয়েছেন। আমি তাঁদের বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করছি। এবার আমি আমার মূল বিষয় – প্রয়াত আতাউস সামাদ ও তার কর্মের উপর সামান্য কিছু আলোকপাত করতে মনোযোগ দেব।

আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আমি নিজেকে এই মুহূর্তে খুবই গৌরবান্বিত মনে করছি। কারণ যে প্রথিতযশা মানুষটিকে (মরহুম আতাউস সামাদ) নিয়ে আজকের এই আয়োজন, আমি তাঁর সরাসরি একজন ছাত্র। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে তাঁর সরাসরি ছাত্র হতে পেরেছিলাম ডাবল এম. এ. ডিগ্রি করার সুবাদে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভের পর আমি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ২য় এম. এ. ডিগ্রি লাভের জন্য ছাত্র হিসেবে ১৯৮০ সালে (শিক্ষাবর্ষ আগে পিছে হতে পারে) এই বিভাগে ভর্তি হই। এই বিভাগে তখনও নিয়মিত শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যুক্ত থেকে পাঠদান করতেন। এঁরা যেমন ছিলেন পেশায় উজ্জ্বল – তেমনি পাণ্ডিত্যেও ছিলেন প্রখর এবং খুবই ভারী। এঁদের কয়েকজন হলেন: আব্দুল ওহাব, সৈয়দ মাহবুবুল আলম, শহীদুল হক, হাসান সাঈদ, আহমেদ হুমায়ুন, আতাউস সামাদ, খোন্দকার আলী আশরাফ, নজরুল ইসলাম, জাওয়াদুর রহমান, শাহেদ কামাল (এখনও বেঁচে আছেন, অন্য সবাই প্রয়াত) প্রমুখ। আমরা ছাত্র হওয়ার আগেই এসব ঋদ্ধ সাংবাদিক অনেকেরই নাম জানতাম।

আতাউস সামাদ স্যার আমাদের রিপোর্টিং পড়াতেন। আমি ৫০ পৃষ্ঠার কষি টানা লাল মলাটের যে খাতাটিতে তাঁর ক্লাশ লেকচার টুকে নিতাম সেই খাতাটি প্রায় ৩৪ বছর সংগ্রহে রাখার পর মাত্র দু'মাস হলো আমার বাসা বদলের সময় পরিত্যক্ত হিসেবে ফেলে দিয়েছি। এই ৩৪ বছরের বহু সময়ে বহুবার আমি স্যারের ওই ক্লাশ লেকচারগুলোর উপর চোখ বুলিয়েছি। খণ্ডকালীন যেসব শিক্ষক আমাদের পাঠদান করতেন তাঁদের মধ্যে আতাউস সামাদ স্যার নিজ থেকেই আমাদের রেফারেন্স বই, যথাযথ নোট কিংবা লেকচার শিট প্রভৃতি সরবরাহ করতেন। মনে আছে তিনি ব্রিটেনের থমসন ফাউন্ডেশনের বহু রিডিং ম্যাটেরিয়াল আমাদের দিতেন এবং তা পড়তে বাধ্য

করতেন। বিভিন্ন উৎস ঘাঁটাঘাঁটি করে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে তিনি ক্লাশে পাঠদান করতেন। আতাউস সামাদ স্যারের দু' একটি ক্লাশের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি একদিন ক্লাশে বলেছিলেন সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিতে হয়। পরিপূর্ণ সাংবাদিক হতে রিপোর্টারকে এক সময়ে সাব-এডিটরের গুণাবলীও অর্জন করতে হয়। অনেক সময় ইংরেজি ম্যাটেরিয়ালস থেকে তথ্য নিয়ে (বাংলায় অনুবাদ করে) রিপোর্ট লিখতে ও তা উপস্থাপন করতে হয়। তিনি প্রায়শ আমাদের সতর্ক করতেন যে – ইংরেজি বই, ম্যাগাজিন বা ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে বাংলায় লিখতে গিয়ে তা যেন আমরা স্রেফ অনুবাদ না করি। মনে আছে তিনি এ ব্যাপারে দু'টি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে ধরা যাক – Mohamedan got a landslide victory against East Bengal – আমরা এই ইংরেজি বাক্যটির অনুবাদ করে বাংলা পত্রিকার জন্য লিখব। তবে এর অনুবাদ যেন আমরা এভাবে না করি যে, মোহামেডান ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে এক 'ভূমিধস' বিজয় পেয়েছে। অনুরূপভাবে – Tense prevails in city, police is patrolling in the streets of Dhaka – এর বাংলা যেন আমরা এভাবে না করি যে – শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে, ঢাকার রাস্তায় পুলিশ পেট্রোল ছিটাচ্ছে।

আতাউস সামাদ ছিলেন খুবই তীক্ষ্ণ এবং অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তিনি তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সংস্কৃতি সংসদের সক্রিয় কর্মী/নেতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন সেই ১৯৫৯ সালে। তখন সাংবাদিকতা বিভাগের জন্ম হয়নি। তিনি ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি *সচিত্র সন্ধানী*তে। মরহুম আতাউস সামাদ বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষার পর পরই মূলত সক্রিয় সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। তিনি এসময়ে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এরপর কিছু কাল সহ-সম্পাদক হিসেবে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায়ও কাজ করেন। সেসময়ের প্রতাপশালী পত্রিকা দৈনিক *আজাদ*-এ তিনি রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৬১ সালে। এখানে তিনি পলিটিক্যাল বিটে কাজ করতেন। *আজাদ* থেকে অল্প কিছু দিনের মাথায় যোগ দেন দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় এবং খুবই কম বয়সে (২৫ বছর) তিনি এই পত্রিকার চিফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে তিনি করাচি থেকে প্রকাশিত *দি সান* পত্রিকায় যোগ দেন এবং এক পর্যায়ে এই পত্রিকাটির পূর্ব পাকিস্তান ব্যুরো চিফ-এর দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অবস্থান করেই আতাউস সামাদ অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায়* (বাসস) যোগ দিয়ে সাংবাদিকতা চালিয়ে যান এবং ১৯৭৬ সালে আবারও দৈনিক *বাংলাদেশ*

অবজারভার-এ ফিরে যান। এর কয়েক মাসের মাথায় তিনি পুনরায় *বাসস* এবং ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ড় তিনি *বাংলাদেশ টাইমস* পত্রিকায় কাজ করেন।

১৯৮২ সালে *বিবিসি*-তে যোগ দিয়ে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ড় দীর্ঘ এক যুগ তিনি *বিবিসি* ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের বাংলাদেশ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। এসময় তিনি পেশায় পরিণত সাংবাদিক হিসেবে দেশ-বিদেশে পরিচিত হয়ে উঠেন। সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর বিচরণ ছিল যেমন উজ্জ্বল তেমন দাপুটেও। তাঁকে এদেশের মানুষ তখন *বিবিসির* আতাউস সামাদ হিসেবে এক নামে চিনতো। এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করতেন। তিনি এই বিভাগের সাথে প্রায় ১৮/২০ বছর যুক্ত ছিলেন। আমি তাঁর সরাসরি ছাত্রদের একজন। বারবার এই উচ্চারণটি করতে আমার খুব গর্ব হচ্ছে।

এছাড়াও আতাউস সামাদ দৈনিক *মাতৃভূমি*, দৈনিক *আমার দেশ* (উপদেষ্টা সম্পাদক) প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেছেন। ২০০৭ সাল তিনি *এনটিভি*-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবেও কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও কয়েকটি বিদেশি পত্রিকা, যেমন *আরব টাইমস*, *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর*, *ডেকান হেরাল্ড*-এর ঢাকা প্রতিনিধি হিসেবে রিপোর্ট পাঠাতেন। রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি দৈনিক *ভোরের কাগজ* এবং এক সময়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন* পত্রিকায় যথাক্রমে 'এই সময়, এই জীবন' এবং 'আটলান্টিকের দুই তীরে' নামে কলাম লিখতেন যা ছিল খুবই জনপ্রিয়। তিনি *প্রথম আলো*, *কালের কণ্ঠ*, *যুগান্ড়র*, *সমকাল* প্রভৃতি দৈনিকেও নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তিনি অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক *এখন* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং এটির প্রকাশকও ছিলেন তিনি।

প্রয়াত আতাউস সামাদের অধিকাংশ লেখা ছিল ইংরেজিতে। বাংলা ভাষায়ও তাঁর দারুণ দখল ছিল এবং বাংলা ভাষায় তাঁর অনেক লেখা রয়েছে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি লেখা ছিল বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর, বর্ণনায় সাবলীল, বিশে ষণের সূক্ষ্মতায় অতুলনীয়। মোটাদাগে আমরা প্রয়াত আতাউস সামাদকে সহ-সম্পাদক, রিপোর্টার, সাংবাদিকতার শিক্ষক, কলামিস্ট, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতি পরিচয়ে পেয়েছি। এছাড়াও তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থেকে সক্রিয়ভাবে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মরহুম আতাউস সামাদ ১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার চাকরির সুবাদে তিনি যেমন অবিভক্ত ভারতে আজকের এপার বাংলা-ওপার বাংলার বহু জায়গায় থেকেছেন, ঘুরেছেন। তেমনি পেশার কারণে দেশ-বিদেশের বহু অভিজ্ঞতা জমা হয়েছিল আতাউস সামাদের ভান্ডারে। তিনি এভাবে হয়ে ওঠেছিলেন এক ঋদ্ধ মানুষ আর উঁচু মাপের সাংবাদিক।

তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরুটা সহ-সম্পাদক হিসেবে, তবে সাংবাদিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কাজ করেছেন রিপোর্টিং-এ। তাঁর অসংখ্য রিপোর্ট তাঁকে

সাংবাদিক পরিচয়ের শিখরে তুলে এনেছিল। আতাউস সামাদ ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষার পত্রিকায় কাজ করেছেন। *দি পাকিস্ড়ান অবজারভার*, *দি বাংলাদেশ অবজারভার*, *বিএসএস*, *দি সান*, *দি হলিডে*, *দি বাংলাদেশ টাইমস*সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। সাপ্তাহিক *ঢাকা কুরিয়ার*-এ ইংরেজিতে তাঁর প্রচুর নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে তিনি গাজী শাহাবুদ্দিন সম্পাদিত *সচিত্র সন্ধানী* পত্রিকায় ছোট আকারে নিয়মিত কলাম লিখতেন। ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর স্ত্রী মিসেস কামরুন নাহার (রেণু ভাবী) তাঁকে তাঁর এযাবৎ প্রকাশিত রিপোর্ট/কলাম নিয়ে একটি বই লেখার তাগিদ দিতে শুরু করেন।

আতাউস সামাদ স্যারকে আমরা জানতাম একজন গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ হিসেবে। কিন্তু তিনি কীরকম রসিক মানুষ ছিলেন তা বুঝতে হলে একটি ঘটনা তাঁর নিজ বয়ানেই শুনতে হবে। আতাউস সামাদকে তাঁর স্ত্রী একটি বই লেখার তাগিদ দেয়ায় তিনি এক জায়গায় লিখেছেন – "কোনো পুরুষ মানুষ বৌয়ের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, সে যে কাজটা করে দিতে বলছে সেটা তার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। তাই একটা ছুতো বের করে বললাম, দেখ, কম বয়সে *আজাদ* বা *অবজারভার*-এ যেসব রিপোর্ট লিখেছি তার তো কোনো কপি রাখিনি। আর ওগুলোর মাথায় বেশিরভাগ সময় লেখা থাকতো 'বাই আওয়ার স্টাফ করেসপন্ডেন্ট'। এখন ওর কোনটা আমার লেখা ছিলো আর কোনটা কোন সহকর্মীর তা মনে নেই। কাজেই পুরনো লেখা দিয়ে হবে না। রেণু বললো, তাহলে *হলিডে* দেখ, ওতে তোমার বেশির ভাগ লেখা নামে বেরিয়েছে।

হলিডে দেখলাম এবং তখন ভালোভাবে বুঝলাম যে, বইয়ের লেখা আর পত্রিকার লেখায় অনেক তফাত। রিপোর্টে আমরা যা লিখি, তা আজকের ঘটনার বিবরণ আগামীকালই পাঠক পড়বে সেজন্য লেখা, আর তাও ওই অল্প সময়ে যতটুকু জানা যায় ততটুকু লেখা। ওই একই রিপোর্ট রেডিও বা টেলিভিশনের জন্য লিখলে তা তো লিখতে হয় এই মুহূর্তের প্রচারের জন্য। লেখার পরিসর আরো কম। সাপ্তাহিক পত্রিকার লেখাও সময়ের ছোট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এসব লেখা বাসি হতে হতেই এদের প্রয়োজন ফুরায়। আর লেখার সময় পলায়মান দিনটির সাথে এর এত বেশি যোগ থাকে যে, পরে সেগুলো পড়তে মজা লাগে না। রেণুকে এসব বলে বই তৈরী করায় ক্ষান্ড় দিলাম"।

সাংবাদিক আতাউস সামাদকে আমরা কলামিস্ট আতাউস সামাদ হিসেবে দেখতে পাই মূলত শফিক রেহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন* এর পাতায়। *যায়যায়দিন*-এ তাঁর নিয়মিত কলামের নাম ছিল 'এ কালের বয়ান'। এই শিরোনামে তিনি কেন কলাম লিখলেন এ ব্যাপারে আতাউস সামাদ বলছেন – 'আমি জানতাম কলাম লেখা সিরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু শফিক রেহমান তাঁর পত্রিকার জন্য আমাকে নিয়মিত কলাম

লিখতে হবে বলে দায়িত্বটা আমার উপর চাপিয়ে দিলেন; যা আমার ভালো লাগে, যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে হয় তাই লিখতে বললেন'। আতাউস সামাদ জানাচ্ছেন, 'যদি এমন একটা নাম বের করতে পারি যাতে চানাচুরের মতো পাঁচ-ছ'টা জিনিস মেশানো যায় আর এই উপাদানগুলোর পরিমাণ যদি পছন্দ মতো কমানো-বাড়ানো যায় তাহলে আমার খুব সুবিধা হয়। কোনো একটি বিষয়ে বা একটি ধাঁচে আটকে পড়ার বিপদ বা বাধ্যবাধকতা থাকে না'। এভাবে আতাউস সামাদ শুর করেছিলেন কলাম লেখা। আতাউস সামাদ তাঁর লেখাজোকার ব্যাপারে একদা উলে খ করেছেন, 'দৈনিক পত্রিকায়, সাপ্তাহিকে, রেডিও-টেলিভিশনে বড় বড় মানুষের আর বড় ঘটনার খবরতো রোজই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে ওই সব বড় বড় মানুষের কাজ আর ঘটনা কিভাবে মিলাই, কখন আশান্বিত হই আর কখন দুঃখিত হই, তাঁদের কাজকর্ম কেমনভাবে আমাদের জীবন ও চিন্ড়া-ভাবনাকে প্রভাবিত করছে অথবা আমরা উলুখাগড়ারাও কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবি কি-না, আর সেরকম ভাবলে কিই-বা করি এসব নিয়ে লেখার চেষ্টা করবো'। এখান থেকে অনুমান করা যায় সাংবাদিক আতাউস সামাদের মধ্যে সব সময় একটা গণমুখী মনন কাজ করতো।

প্রয়াত আতাউস সামাদ ১৯৮০-র দশকের শুর থেকে ১৯৯০ দশকের শেষ পর্যন্ড়প্রায় ১৮/২০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। কিভাবে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং কিভাবে তা ইতিবাচক আকারে উপস্থাপন করতে হয় সে ব্যাপারে তিনি আমাদের একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। এবার তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত সেই পেশাগত গল্পের কথা বলি। সম্ভবত ১৯৮৮ সালের বন্যার পর পরই একটি ঘটনা। স্মর্তব্য ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৬০/৭০ শতাংশ এলাকা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্যার কারণে পানির নিচে তলিয়ে ছিল। এমনকি ঢাকা শহরেরও অধিকাংশ এলাকা ছিল পানির নিচে। যখন বন্যার পানি নামতে শুর করে তখন পত্র-পত্রিকা তথা গণমাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ মানুষ, পশু, গর-ছাগল, হাঁস-মুরগী প্রভৃতির প্রাণহানিসহ ভেসে আসা এসবের লাশের ছবি সম্বলিত খবর মানুষকে খুব আহত এবং আলোড়িত করতো। সামাদ স্যার এ সম্পর্কে আমাদের একদিন শুনালেন যে, *বিবিসি* থেকে তাঁকে বলা হয়েছে যে এই ক্ষয়ক্ষতি, মানুষ কিংবা প্রাণীকূলের লাশ ছাড়া বন্যাউত্তর উদ্যোগের উপর ভিন্ন ডাইমেনশনে কোনো রিপোর্ট পাঠানো যায় কি-না? তিনি একদিন খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নৌকা নিয়ে বুড়িগঙ্গা দিয়ে চলছেন আর দু'কূলের মানুষের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যে, বন্যাপরবর্তী আশা-আকাঙ্ক্ষা, করণীয়, প্রত্যাশা এসব নিয়ে সাধারণ মানুষ হিসেবে তারা কী ভাবছেন ? এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন নদীতে বাঁশের ভেলায় ভাসমান একটি ছোট পরিবার (বন্যায় তাদের বাড়িঘর তলিয়ে গেছে আর সেকারণে বাঁশের

ভেলা বানিয়ে তাতে বসবাস করছেন) – তাদের সাথে কলা গাছ দিয়ে বানানো আর একটি ভেলা। কলা গাছের ভেলাটিতে তারা কাদার প্রলেপ আর মাটি দিয়ে কিছুটা উঁচু করে তাতে ধান ছিটিয়েছেন যাতে বন্যার পানি নেমে গেলে এখান থেকে গজিয়ে উঠা ধান গাছের চারা বন্যায় ডুবে যাওয়া জমি জেগে ওঠার সাথে সাথে সেখানে তা লাগানো যায়।

মানুষের বুদ্ধিমত্তা আর বেঁচে থাকা কিংবা জীবন-জীবিকা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিকল্প পন্থা ধরে এগুনো বা ইনোভেশন যাই বলি এটিকে মুখ্য করে সামাদ স্যার *বিবিসি*তে ওই পরিবারের জীবন সংগ্রামের উপর একটি রিপোর্ট পাঠালেন। এজন্য তিনি *বিবিসি*র কাছে খুবই সমাদৃতও হয়েছিলেন। শুধু দুঃখ-কষ্ট আর মানুষ কিংবা প্রাণীকূলের লাশ নয়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা আজকের দিনের মতো বোমা মেরে মানুষ হত্যা কিংবা সমাজকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয়ার মতো ঘটনার নেতিবাচক দিক নিয়ে নয় – ঘটনাকে ইতিবাচক দিক (angle) থেকে উপস্থাপন করেও যে ভাল সাংবাদিকতা করা যায় এবং দেশ ও দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এই ধরনের কর্মের উদাহরণ আতাউস সামাদের সাংবাদিক জীবনে প্রচুর রয়েছে। আতাউস সামাদ ছিলেন খুবই সাহসী সাংবাদিক। ঘটনার উপর তাঁর পর্যবেক্ষণ যেমন ছিল তীক্ষ্ণ তেমনি উপস্থাপনাও ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও মানবিক। তাঁর লেখা রিপোর্ট/প্রবন্ধ কখনও ছিল ঝাঁঝালো, কখনও রসালো। সমাজের আলো-অন্ধকারকে নিয়ে দেশ এবং মনুষ্যত্বকে সামনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর মূল দীক্ষা।

আতাউস সামাদের বর্ণাঢ্য এক রিপোর্টারের জীবন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর নিবন্ধ/কলাম লিখেছেন। তাঁর নিজ লেখালেখি নিয়ে তিনি 'একালের বয়ান' শীর্ষক একটি বই লিখে গেছেন। এই বই থেকে তাঁর একটি লেখা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। তাঁর এই লেখা থেকে বোঝা যাবে তাঁর লেখার ধার এবং উপস্থাপনা কৌশল কতটা প্রখর ছিল? আতাউস সামাদ তাঁর বইয়ে মন্ত্রী/আমলাদের আচরণ এবং তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের বিড়ম্বনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে 'আর্দালির কুর্নিশে গর্বিত' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছেন (হুবহু তাঁর ভাষায়):

> বাংলাদেশের সচিবালয়ে মন্ত্রীরা বসেন। সেই সচিবালয়ের একটা দালানের নিচ দিয়ে ছোট একটা টানেলের মতো পথ আছে। ওই পথের দুটো ভাগ। তার একটা দিয়ে গাড়ি ভেতরে যায় আর অন্যটা দিয়ে বেরোয়। ওই পথটা শুধুই গাড়ির জন্য বলে মনে হয়। কারণ ওটা দিয়ে ভারি লোকদের বড় বড় গাড়ি জোরে জোরে ছোটাছুটি করে সব সময়। ওখান দিয়ে হাঁটাচলা করলে পদচারণাকারীর বিপদ হতে পারে।
>
> এক সকালে সচিবালয়ে দেখলাম ওই টানেলটার মুখে সব গাড়ি থেমে গেছে, আর ভেতরে নিশান লাগান একটা ঢাউশ গাড়ি দরজা খুলছে। পেছনে অপেক্ষমাণ সব গাড়ির ড্রাইভার ভদ্রলোকের মতো চুপচাপ বসে আছে। অন্য সময় যারা যখন-তখন যত্রতত্র, তা সচিবালয়

হোক বা হাসপাতাল হোক, অভদ্রের মতো গাড়ির ভেঁপু বাজায়, এখন তারাও যেন বদলে গেছে কোন এক যাদুবলে।

ওই ঢাউশ গাড়ির দরজা দিয়ে ধীরে, অতি ধীরে নামলেন একজন মন্ত্রী। পথের ওপর এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়ালেন, আলতো করে টান দিয়ে সাফারির দুমড়ে যাওয়া নিচের দিকটা সোজা করলেন, তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন অদূরবর্তী লিফটের দিকে। লিফটে ওঠা পর্যন্ত তিনি ডান দিকে বা বাঁ দিকে তাকালেন না অথবা কোনোদিকে ঘাড় ফেরালেন না।

তিনি লিফটের ভেতর অদৃশ্য হতে হতে ওই ঢাউশ গাড়িটার ভেতর থেকে গোটা দুই আর্দালি নেমে এলো। একজনের হাতে ব্রিফকেস আর অন্যজনের হাতে এক বান্ডিল খবরের কাগজ ও কিছু ফাইলপত্র। তারা নেমে গেলে ঢাউশ গাড়িটার দরজা বন্ধ হলো। সেটা আবার চলতে শুরু করলো, তবে গজ বিশেক এগিয়ে পার্কিং লটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবার অন্য গাড়িগুলো পুর্ণোদ্যমে চলা শুরু করলো ও ডাইভাররাও তাদের স্বভাব অনুযায়ী হর্ন বাজাতে বাজাতে বিচ্ছিরিরকম শব্দদূষণ সৃষ্টি করতে ভুললো না। তবে মন্ত্রী সাহেব যদি তাঁর গাড়িটা আর দশ গজ মতো এগিয়ে নিয়ে থামাতেন তাহলে এখানে কোনো গাড়িই আটকে পড়তো না। তাছাড়া তিনিও বন্ধ লিফটে ওঠার আগে পৃথিবীর পরিষ্কার আলো ও একটু খোলা বাতাস উপভোগ করে নিতে পারতেন।

যাঁরা ঘাড় কোনোদিকে বাঁকান না, আর সামনের দিকে ছাড়া কোনো দিকে তাকান না ইংরেজিতে তাঁদেরকে স্টিফনেক বলে। এই ধরনের লোক নিজের পদমর্যাদার বিভোর থাকতে থাকতে এমন হয়ে যান। আর যাঁরা সামনে সামান্য দুরের পর আর কিছু দেখেন না তাঁদেরকে বাংলায় অদুরদর্শী বলে। আমাদের সেদিনের মন্ত্রী স্টিফনেক ও অদূরদর্শী এই দুটোই। তা না হলে তিনি একটু এগিয়েই গাড়ি থামাতেন। মাঝখানে থেকে অন্যদের অসুবিধা করতেন না। তাই এখন অবাক হই না যখন শুনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেবা বিভাগের কাজকর্ম বেশির ভাগ মানুষই যন্ত্রণার সমতুল্য মনে করেন।

আরেকজন মন্ত্রী আছেন যিনি সদাই ব্যস্ত থাকেন। তবে প্রায় কেউই বলতে পারে না সেটা কী নিয়ে? তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তিনি এখন আর পারতপক্ষে ওই মন্ত্রীর দফতরের দিকে পা বাড়ান না। সেই দেখা করার চেষ্টার প্রথম ধাপে ভদ্রলোককে কষ্ট করে সচিবালয়ে ঢোকার একটা পাস যোগাড় করতে হয়েছিলো। ভেতর ঢুকে অনেক তলা ওপরে মন্ত্রীর দফতরে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে, সেখানেও কোলাপসিবল গেট লাগান হয়েছে। তার অর্ধেকটা বন্ধ এবং বাকি অর্ধেকটা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুলিশ। এঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেই অপর ফটক পেরিয়ে ভদ্রলোক পৌঁছলেন মন্ত্রীর একান্ত সচিবের কামরায়। তাঁর সাথে আগে ফোনে কথা হয়েছিলো যে, তিনি মন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে সেদিন একান্ত সচিব তখনও দফতরে পৌঁছান নি, মন্ত্রীর সাথেই কোথায় জানি আছেন! ইতোমধ্যে আরো বেশ কয়েকজন দর্শনার্থী ওই কামরায় এসে জড়ো হলেন। শেষ পর্যন্ত এক সময় একান্ত সচিব এলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, মন্ত্রীও এসেছেন। একান্ত সচিব সমবেত দর্শনার্থীদের কয়েকজনের কাছ থেকে তাঁদের পরিচয় জেনে আলাদা আলাদা স্লিপ পাঠিয়ে

দিলেন মন্ত্রীর কাছে। আমাদের ভদ্রলোকের ডাক পড়লো অন্য বেশ কয়েকজনের আগে। তাই তিনি অন্যদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে বিজয়ীয় হাসির ছোঁয়া লাগিয়ে মন্ত্রীর কামরায় গেলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সুখ কত ক্ষণস্থায়ী। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখেন যে, মন্ত্রীর টেবিলের পাশে বসে আছেন জনা চারেক হোমরা-চোমরা আর সোফায় বসে আছেন আরো ছয়-সাতজন। এঁদের মধ্যে দু'তিনজন মহিলা। তিনি এই কিউতে সবার শেষে। এদিকে মন্ত্রী তখন ফোনে কথা বলছেন আর সবাই তাঁর সাথে তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন। ভদ্রলোক তখন একটা সোফার প্রান্তে বসলেন এই আশা করে যে, ফোন শেষ হলে কিউ এগুতে থাকবে।

কিন্তু মন্ত্রী ফোনে কথা বলতেই থাকলেন। ইতোমধ্যে আরো দু'তিনজন দর্শনার্থী ঘরে ঢুকলেন। তবু মন্ত্রী ফোনে কথাই বলতে থাকলেন। ততক্ষণে আরো জনা কয়েক ঢুকে পড়লেন মন্ত্রীর ঘরে। এয়ারকন্ডিশনার লাগানো ঘরের হাওয়াটা এবার যেন ঠান্ডা থেকে নাতিশীতোষ্ণ হয়ে উঠলো এত লোকের ভিড়ে, কিন্তু ফোনে মন্ত্রীর কথা আর শেষই হতে চায় না। তিনি তাঁর কোনো এক আপনজনকে উপদেশ খয়রাত করছিলেন এবং তা করেই যাচ্ছিলেন। দেয়ালে ঘড়ির কাঁটা তখন বেলা আড়াইটার কাছকাছি, ঘরের প্রায় সবাই যে যতখানি পারেন মন্ত্রীর টেবিলের কাছে অবস্থান নিয়েছেন। তবে আমাদের এই ভদ্রলোক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সোফার প্রান্তে সেই দূরেই থেকে গিয়েছিলেন। সেদিন আর কথা বলা যাবে না – এক সময় এটা বুঝে তিনি তাই সবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে। কোলাপসিবল গেটের কাছে এসে দেখেন যে, তাঁর পরিচিত দু'জন মহিলা সেই কনস্টেবল সাহেবকে অনুনয়-বিনয় করছেন তাঁদের ভেতরে যাবার অনুমতি দিতে।

"আপনারা এখানে কী করছেন," তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমারা মন্ত্রীকে আমাদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

"এখানে তো খুব ভীড়। আমি তো ওঁর ঘরে ঢুকেও কথা বলতে পারলাম না।"

"কিন্তু আপনারা তো প্রতিষ্ঠিত মানুষ, আপনারা উনার বাড়িতে যান না কেন ?"

"বলেন কি, ওখানে তো দুই দিন গেছি। সেখানে তো নিউ মার্কেটের গেটের ভীড়ের মতো অবস্থা।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের ভদ্রলোক সেই যে সেখান থেকে সরে পড়লেন আর যাননি।

এই ধরনের একটা ঘটনার আমি নিজেও সাক্ষী। আমার এক বন্ধুর ভাগ্যেও প্রায় এমনটা জুটেছে।

আমি গিয়েছিলাম আমার আরেক যে বন্ধু অসুবিধায় পড়েছে তার জন্য একটা সাহায্য চাইতে। পরে বাধ্য হয়েই তাকে অন্য কোনো রাস্তা ধরতে বলেছি। তা কোন রাস্তা হবে সেটা সে নিজেই ঠিক করে নিক। তবে এখন এটুকু বুঝি যে, এই মন্ত্রী সাহেবের মতো লোকদের কাছে গিয়ে যখন মানুষ দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে পারে না, তখন তারা ছোটে এঁদের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, রাজনৈতিক সচিব, এমন কি পিওন বা

ড্রাইভারদের কাছে। এর থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন একটা সমস্যা, তা হলো মন্ত্রীদের একান্ড় সচিব বা একান্ড় সহকারী বা অন্য পাইক-বরকন্দাজদের ফোন। এঁরা মন্ত্রীদের অধীনস্থ বিভাগের কর্মচারীদের ফোন করেন মন্ত্রীর বা তাঁর দফতরের নাম করে। ভাবখানা এমন যে, মন্ত্রীর হুকুমেই তাঁরা ফোন করছেন। অন্যরা ভাবে সেটা হতেও পারে, কারণ কিছু ফোন তো তাঁরা মন্ত্রীর কাজের জন্য বা তাঁর নির্দেশেই করেন। এর মধ্যে মন্ত্রীর নিজস্ব লোকদের তয়তদ্বিরও থাকে কখনো বেশ স্পর্শকাতর বিষয়ে। বাকি কলগুলো যে কার স্বার্থে হয় সে খবর কে রাখে। রাখার ফুরসৎ কোথায় গপ্পি মন্ত্রীদের।

তবে এসব হতে হতে এখন মন্ত্রীদের নাম ব্যবহার করে জালিয়াতিও হচ্ছে। কিছুদিন আগে তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একজন একান্ড় সচিবকে তাঁর অফিস থেকে ধরে নিয়ে গেল দুর্নীতি দমন ব্যুরো – ধাপ্পা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেবার অভিযোগে। সরকারই সে খবরটা প্রকাশ করেছিলো। সম্প্রতি একজন কনিষ্ঠ কিন্তু বলিষ্ঠ মন্ত্রীর পিয়নকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আমাদের ভদ্রলোক যে মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন তিনি অবশ্য সংসদে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলকে বারকয়েক অস্বস্ড়িকর অবস্থায় ফেলেছেন তাঁর অদক্ষতা, অক্ষমতা ও এলাকাপ্রীতির কারণে। সেজন্যই অনেকে প্রশ্ন করেন, কী তাঁর এত ব্যস্ড়তা যে, সাক্ষাতপ্রার্থীদের সাথে দুই দ- তিনি ভালো করে কথা বলতে পারেন না? কার কাজে লাগছে মন্ত্রী সাহেবের সময়ের অপচয় অকারণ আড্ডায় বা টেলিফোন সংলাপে?

টেলিফোন কৃষ্টি প্রসঙ্গ ফেরত আসায় কয়েকজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে দূরালাপনী সংলাপের কথা মনে পড়ছে।

আমি এমনিতে কোনো কর্তাব্যক্তিকে টেলিফোন করতে খুব ভয় পাই। ফোনের অপর প্রান্ড় থেকে কোনো শক্তিধর ব্যক্তির গম্ভীর গলা ভেসে আসলেই আমার হাতের চেটোর ঘামে রিসিভার ভিজে যায়, আমার গলা শুকিয়ে যায়, জিভ জড়িয়ে যায়, চোখে সব কিছু সবুজ দেখি আর বুক টিপ টিপ করে। সেইজন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি বড় কর্তাদের পি. এ. সাহেবদের ধরতে। তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে লাইন লাগিয়ে দেন তাহলে বুঝি কর্তাব্যক্তি আপাতত খোশ মেজাজে আছেন, আমি দু'তিন মিনিট কথা বলতে পারি নির্ভয়ে। অন্ড়ত আমাকে উনি "আপনি ভালো আছেন তো (অর্থাৎ ব্যাটা, এবার ফোন ছাড়)" বলে ফেলার আগেই আমি গোটা দুয়েক প্রশ্ন করে দিত পারবো।

একটা খবর সংগ্রহের তাগিদে একজন সচিবকে একদিন ফোন করলাম এরকম ইতস্ড়তভাবেই। মনে করলাম একান্ড় সহকারি ধরবেন। কিন্তু ওপাশ থেকে ভারিক্কি গলায় 'কে' শুনেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে, সচিব সাহেব নিজেই ফোন ধরে ফেলেছেন। তবু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম সচিব সাহেব কি আছেন?" উত্তর এলো, "আপনি কে?" তাড়াতাড়ি পরিচয়টা বললাম। আবার উত্তর এলো, "বলুন, আমি বলছি, আপনি তো সরাসরি নম্বরে ফোন করেছেন। এই ফোনটা বদলাতে হবে দেখছি।"

ইচ্ছা হয়েছিলো তখনই ফোন ছেড়ে দিই। তবু কথা চালিয়ে গেলাম দুটো কারণে। একটা হলো, তখন আমি মরিয়া হয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছি যাতে সচিব সাহেব এটা ধরে

না নেন যে, তিনি আমাকে যথেষ্ট অপমান করতে সফল হয়েছেন যার দর–ন আমি ফোন ছেড়ে দিলাম। আর দ্বিতীয় কারণ ছিলো তাঁর কাছে নিজেকে দেখানো যে, রিপোর্টারের কাজ করতে করতে আমার চামড়া কত মোটা হয়েছে।

এতটা নয়, তবে এর কাছাকাছি অবস্থা হয়েছিলো আরেকবার একজন আধা-সচিবের সাথে কথা বলতে গিয়ে। তাঁকে ফোন করেছিলাম এক ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে। যে তথ্যটা জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছে তা তিনি দিতে পারলেন না এবং এই বলে অব্যাহতি চাইলেন যে, এটা অমুক দফতরের তমুক সচিবের ব্যাপার, কাজেই আমি যেন তাঁর সাথে কথা বলি। কিন্তু আমার 'ডেডলাইন' তখন এসে যাচ্ছে। তাই তাঁকে অনুরোধ করলাম সেই সচিবের বাসার ফোন নম্বরটা আমাকে দিতে। তিনি বললেন, "তা তো দিতে পারবো না, ওঁর নম্বর তো আমার মনে নেই।" তখন আবার বললাম, "আপনার বাসায় বোধ হয় মন্ত্রী আর সচিবদের নম্বর থাকবে, কারণ অফিসের পরও তো আপনাদের যোগাযোগ করা দরকার পড়ে।"

"তা পড়ে, তবে ফোন নম্বরের বইয়ের দরকার পড়ে না, কারণ আমরা তো লাল টেলিফোনে কথা বলি।"

তিনি ভালো করে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁরা দেওয়ান-ই-খাসের লোক, লাল টেলিফোন লাইন যাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেখানে অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। আর তাঁরা নিজেরা যতক্ষণ ওই জগতে বসবাস করছেন ততক্ষণ বাইরের দুনিয়ার মানুষের কথা তাঁদের না ভাবলেও চলবে।

এমনই আরেক জর–রি খবরের জন্য আরেক আধা-সচিবের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় ফোন করেছিলাম। তখন খবরটা লিখতে পারলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থেও কাজে লাগতো। সবদেশে সরকারই মাঝে মধ্যে রিপোর্টারদের সহায়তা নেন এমন বিশেষ দরকারের সময়, যেমন অনেক সরকারই নিয়েছিলো *বিবিসি*র রিপোর্টারদের সাহায্য কুয়েত সঙ্কটের সময় সেখানে তাদের নাগরিকদের জর–রি বার্তা জানাতে। তবে সেদিন আমার ঈপ্সিত ব্যক্তি বাড়িতে ছিলেন না। এক মহিলা ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, "ট্রাই আফটার অ্যান আওয়ার।"

এক ঘন্টা পরে আবার ফোন করলাম। সেই একই নারীকণ্ঠ আবারও ইংরেজিতে উত্তর দিলো, "হি হ্যাজ নট কাম হোম ইয়েট। আই সাজেস্ট ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড হিম অ্যাট হিজ অফিস টুমরো" (তিনি এখনো বাড়ি ফেরেন নি। আমার উপদেশ হলো, আপনি তাঁকে কাল অফিসে খোঁজ করবেন।)।

তিনি দয়া করে একথা বললেন না, "আপনার নম্বরটা দিন, উনি বাড়ি আসলে ওঁকে জানাবো।" বরং প্রকারান্ড়রে পথ দেখিয়ে দিলেন আমাকে এবং এও বুঝিয়ে দিলেন যে, আমি সেই রাতে তাঁদেরকে যেন আর বিরক্ত না করি। রিপোর্টারদের ভাগ্যে এসব জোটে। কী আর করা!

অবশ্য এখনও কিছু সরকারী কর্মকর্তা আছেন যাঁদের কাছ থেকে মার্জিত আচরণ ও সহযোগিতা পাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওঁদের মতো কয়েকজন না থাকলে দেশটা আমাদের কাজের জন্য অযোগ্য হয়ে যেত।

...

তাঁর লেখনী কতটা সাবলীল, কতটুকু বিশে ষণধর্মী, কতটুকু অর্থবাহী, যা তিনি বলতে চান তা উপস্থাপন করার ক্ষমতা কতটা পূর্ণাঙ্গ এসব আতাউস সামাদের এই লেখাটি থেকে বোঝা যায়। আসলে তাঁর অধিকংশ লেখার প্রাঞ্জলতা ও গভীরতা ছিল খুবই উঁচু মানের।

আতাউস সামাদের জন্ম ১৯৩৭ সালে। তিনি ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমার নিজের লেখা *বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় আলোকিতজনেরা* বইয়ে আতাউস সামাদকে নিয়ে এক চিলতে লিখনী রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে 'আতাউস সামাদ: জীবনে ও পেশায়' শীর্ষক একটি সম্পাদনাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসবে আতাউস সামাদের জীবন, কর্ম এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য গুণীজনের ধারণা কেমন সে সম্পর্কিত একটি চিত্র পাওয়া যাবে। আতাউস সামাদের মৃত্যুর পর ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিন আতাউস সামাদকে নিয়ে তাঁর একটি লেখার শিরোনাম করেছিলেন 'গণতন্ত্রের বার্তা বাহকের প্রস্থান'। প্রয়াত এবিএম মূসা আতাউস সামাদকে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথিকৃত' এবং কামাল লোহানী তাঁকে 'দক্ষ রিপোর্টার – সাহসী সাংবাদিক' বলে উলে খ করেছেন। সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন – "ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই ছিল আতাউস সামাদের বিস্ময়কর দক্ষতা। বাংলায় তাঁর ভাষার প্রসাদগুণ এতটাই ছিল যে, আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে বলতাম, সামাদ, তোমার সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নেয়া উচিৎ"। আাতউস সামাদ সম্পর্কে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য হচ্ছে – 'পেশাগতভাবে কোনটা সংবাদ আর কোনটা নয়, এটা চিহ্নিত করতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য'। সাংবাদিক সোহরাব হাসানের ভাষায় – 'আতাউস সামাদ ছিলেন বৃত্তের বাইরের এক মানুষ'। কোনো সন্দেহ নেই যে আতাউস সামাদ ছিলেন বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতে এক স্মরণীয়-বরণীয় নাম। তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল, গণমুখী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাংবাদিকতা চর্চার এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব। আতাউস সামাদ আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকুন।

স্মারক বক্তা

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল্যয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS)-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৫৫ সালে বাগেরহাট জেলায় তাঁর জন্ম। বিভিন্ন সরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যায়তনিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন দায়িত্বপালনের এক বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য জীবন রয়েছে তাঁর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে বিএ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব ল ডিগ্রি ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. সালাম ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. সালাম ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ঐ বিভাগের অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটি কলেজ ও রোমানিয়ার লুসিয়ান ব াগা ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে ২০০৬-০৯ সময়কালে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবেও ২০০৯ সালে দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. সালাম প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসেবেও ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ড. সালাম দেশ বিদেশের বিভিন্ন সেমিনার-কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি ৫টি গ্রন্থ, ৪টি ম্যানুয়েল রিপোর্ট ও ৩৩টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

যিনি আজীবন সম্মাননা পেলেন

তোয়াব খান

দীর্ঘ ষাট বছরের সাংবাদিকতা জীবনের এক লড়াকু সৈনিকের নাম তোয়াব খান। দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিকদের শীর্ষে তাঁর অবস্থান। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন নির্ভীক সাংবাদিক তোয়াব খান। সুশৃঙ্খল, নির্মোহ, সময়ের নিরিখের যথার্থ অগ্রসর, উদার, মুক্তচিন্তার অধিকারী তোয়াব খান। আজও তিনি তারুণ্যের শক্তি নিয়েই পেশাগত জীবনে ছুটে চলছেন অবিশ্রান্ত গতিতে। বৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর সাংবাদিকতা জীবন।

তোয়াব খান – যিনি শিশু বয়সেই দেখেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তর, ব্রিটিশ শাসনের উগ্রতা, ৪৭ সালের দেশভাগ, ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার মন্ত্রে জেগে ওঠার প্রয়াস, দেখেছেন পাকিস্তান সরকারের শাসন–শোষণের রোষানল, ৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার দাবিতে জেগে ওঠা স্বদেশ, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিটি ঘটনার ভেতরে শাণিত হয়েছে তাঁর চেতনা, পেশা।

সাংবাদিক তোয়াব খানে জন্ম ১৯৩৪ সালের ২৪ এপ্রিল সাতক্ষীরা জেলার রসুলপুর গ্রামে। পিতা আবদুল ওহাব খান, মা মোসাম্মত জোবেদা খানম। ৩ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। তাঁদের বাড়িটি ছিলো স্বদেশী আন্দোলনের একটি কেন্দ্রের মতো। পরিবারের অনেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম দৈনিক *আজাদ*-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ। সাতক্ষীরার শতাব্দীপ্রাচীন প্রাণনাথ হাইস্কুলে (পিএন) তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। এই স্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর পড়াশুনা করেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সমকালীন ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করতেন। তবে ১৯৫৫ সালে প্রগতিশীল পত্রিকা *সংবাদ*-এ সাব-এডিটর হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। পত্রিকাটি ছিল তৎকালীন বামপন্থী নেতাকর্মীদের মতপ্রকাশের একটি অভয়স্থল। মনি সিংহ, খোকা

রায়, নেপাল নাগ, বারীণ দত্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ আলী – এঁদের মতো নেতাদের সান্নিধ্য তোয়াব খানের জীবন ও চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, এভাবেই অজান্তে হয়ে গেছে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দীক্ষা। বদলে গেছে জীবনের গতিপথও। এভাবেই অনেকটা ঘোরের মধ্যে চলে যাওয়া। তাতে ক্রমেই শিকেয় উঠেছে পড়াশুনা।

১৯৬১ সালে থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি *সংবাদ*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি তৎকালীন ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট পরিচালিত *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় যোগ দেন চিফ সাব-এডিটর হিসেবে। ১৯৬৫ সালে তিনি *দৈনিক পাকিস্তান* -এর বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি *দৈনিক পাকিস্তান*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে*। *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র* থেকে তাঁর লেখা ও পাঠ করা 'পিন্ডির প্রলাপ' মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের প্রতিটি বাঙালিকে প্রেরণা যোগাতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যোগ দেন *দৈনিক বাংলায়*-(অধুনালুপ্ত *দৈনিক পাকিস্তান*)। ১৯৭২ সালে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে ট্রাস্ট পরিচালিত এই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ও রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের প্রেস সচিব ছিলেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও মহাপরিচালক ছিলেন ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত।

১৯৯২ সালে *দৈনিক বাংলায়* আবারো সম্পাদক পদে যোগ দেন। এ যেন ছিল তাঁর নিজের ঘরে ফেরা। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার মৌলিক নীতির প্রশ্নে আপস করতে না পারায় তৎকালীন সরকার তাঁকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করে। যোগ দেন দৈনিক *জনকণ্ঠ*র উপদেষ্টা সম্পাদক পদে। সেই থেকে আজ অবধি তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে অফিসে আসেন। এই পত্রিকার প্রতিটি পাতায় তাঁর উদার পেশাদারী আধুনিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

১৯৬২ সালে তোয়াব খান বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী হাজেরা খান। দুই কন্যার জনক তিনি। এর মধ্যে এক কন্যা এষা খান মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর। অপর কন্যা তানিয়া খান আমেরিকার ভার্জেনিয়াতে থাকেন। পেশায় শিক্ষক।

তোয়াব খান বাংলা একাডেমী ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য। সাংবাদিকতার বিশেষ অবদানের জন্য লাভ করেছেন বহু সম্মাননা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কলাম সত্যমিথ্যা, মিথ্যাসত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ *আজ এবং ফিরে দেখা কাল*।

যাঁর নামে ট্রাস্ট

আতাউস সামাদ

আতাউস সামাদের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৬ নভেম্বর, ময়মনসিংহে। বাবার চাকরির সুবাদে হুগলি, কলকাতা, জলপাইগুড়িসহ এপার বাংলা-ওপার বাংলার বহু জায়গা তিনি ছোট বেলায় ঘুরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-র গণআন্দোলনসহ নানা ঘটনার সাক্ষী আতাউস সামাদ প্রায় ৫০ বছর সাংবাদিকতা করেছেন।

বাবার বদলির সুবাদে জলপাইগুড়ির ইন্দ্রাজমল মিডল ইংলিশ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন আতাউস সামাদ। বরিশাল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ১৯৫২ সালে ভর্তি হন বজ্রমোহন কলেজে। কিন্তু বাবার বদলির কারণেই ঢাকায় সলিমুল্লাহ নাইট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তিনি ফজলুল হক হলের প্রচার সম্পাদক হন, জড়িয়ে পড়েন সংস্কৃতি সংসদের সাথে। এ সময়ে তিনি *সচিত্র সন্ধানী* নামে একটি পত্রিকা বের করার কাজে মনোনিবেশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯ সালে অনার্স পরীক্ষার পর তিনি দৈনিক *সংবাদ*-এ সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। কেজি মুস্তাফা, এবিএম মূসা, আব্দুল আওয়াল খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁকে সাংবাদিকতায় আসার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আতাউস সামাদ রিপোর্টিংয়ের কাজটা শুরু করেন দৈনিক *আজাদ*-এ। এ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৬১ সালের পেন সম্মেলন কাভার করেন তিনি। দৈনিক *আজাদ*-এ প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল করে তাঁর রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত এটাই ছিল তাঁর প্রথম রাজনৈতিক রিপোর্ট। সাংবাদিক হিসেবে তখন থেকে তাঁর পরিচিতি শুরু হয়। এর ছয় মাস পরে তিনি *দি পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় যোগ দেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে সেখানে তিনি চিফ রিপোর্টার হয়েছিলেন। *অবজারভার*-এ কাজ করার সময়ে তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারিও হন। পরে মালিক বিরাগভাজন হয়ে পড়লে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৬৯ সালে *দি সান* পত্রিকায় যোগ দেন। পাকিস্তানের করাচিতে ছিল তখন *দি সান* এর হেড অফিস। আওয়াল খান, ফায়জা হক এবং তিনি

ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি। সাংবাদিকতার জগতে পুরো ষাটের দশকটি কেটেছে তাঁর কর্মমুখর সময়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবরের মতো বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, সংবাদ সম্মেলন ও কাজকর্ম নিয়মিত রিপোর্ট করতেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে আতাউস সামাদ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুজিবনগরে তথ্য পাঠাতেন। সংবাদ সংগ্রহ করে নতুন কাগজকে মাটি দিয়ে ঘষে পুরানো করে তাতে লিখতেন, আর ছেঁড়া খামে করে তা পৌঁছে দিয়ে আসতেন নির্ধারিত জায়গায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর যোগসাজশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাংবাদিক নিধন শুরু করে। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর চিফ রিপোর্টার খন্দকার আবু তালেবকে মিরপুরে জবাই করে হত্যা করে পাকবাহিনী। আর *মর্নিং নিউজ*-এর রিপোর্টার বাশারকেও ধরে নিয়ে যায়। এ সময়ই আতাউস সামাদের নয়াপল্টনের বাড়িতে আল-বদর বাহিনী হানা দেয়। কিন্তু আল-বদররা তাঁকে পায় নি। এরকম পরিস্থিতিতে আতাউস সামাদ ভারতে চলে যান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আতাউস সামাদ *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায়* (বাসস) যোগ দেন। তখন বাসসের চিফ এডিটর ছিলেন ফয়েজ আহমদ। *বাসস*-এ আতাউস সামাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সাথে দিল্লি যাত্রা। এ যাত্রায় তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরেও তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে রাশিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত শান্তি আলোচনা কাভার করতে *অবজারভার*-এর চিফ রিপোর্টার হিসেবে দিল্লি গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন *দি মর্নিং নিউজ*-এর বদরুদ্দীন আর *সংবাদ* থেকে শহীদুল্লা কায়সার। দিল্লিতে তিনি *বাসস*-এর প্রতিনিধি হিসেবে সাড়ে চার বছর কাজ করেন। ছয় মাস পর তিনি আবার *বাসস*-এ বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। তার পরের কর্মক্ষেত্র ছিল *বাংলাদেশ টাইম*। ১৯৭২ সালে তিনি আতিকুল আলমের মাধ্যমে *বিবিসি*তে স্টিঙ্গার হিসেবে যোগ দেন। এ সময়ে আতাউস সামাদ এরশাদ সরকারের অপকীর্তির নানা খবর *বিবিসি*তে প্রচার করতেন। আর এরই ফলে ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে গণআন্দোলনের সময় এরশাদ তাঁকে জেলে আটকে রাখেন। ছাড়া পাওয়ার পর পাঁচ মাস পর্যন্ত তিনি কোনো কাজ করতে পারেন নি *বিবিসি*র উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে।

১৯৮৫ সালে উড়িরচরে সাইক্লোন, ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় এবং স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সব খবর *বিবিসি*তে পরিবেশন করেছেন আতাউস সামাদ। ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি *আরব টাইমস*, *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর*, *ডেকান হেরাল্ড* পত্রিকায় রিপোর্ট করেছেন। *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর লেখা 'এই সময়, এই জীবন' এবং *যায়যায়দিন*-এ 'আটলান্টিকের দুই তীরে' কলাম দুটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। দৈনিক *মাতৃভূমি*র সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন কিছুদিন। দৈনিক *আমার দেশ*-এর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

আতাউস সামাদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো *একালের বয়ান*। তিনি ভারত, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লিবিয়া, মিসর, কুয়েত, চীন, বার্মা, ফ্রান্স, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্কসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন।

সাংবাদিকতার জন্য সংবর্ধনা ও পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। ১৯৯২ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

যাঁর উদ্যোগে ট্রাস্ট

এবিএম মূসা

সাংবাদিক, কলাম-লেখক আবুল বাশার মুহাম্মদ (এবিএম) মূসা বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় প্রবাদতুল্য পুরুষ। পঞ্চাশ দশক থেকে আজ অবধি দেশের সংবাদ মাধ্যমের ক্রমবিবর্তনের পথে যাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলছেন এবিএম মূসা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার কুতুবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশরাফ আলী ছিলেন সে সময়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার মার নাম মাজেদা খাতুন। তারুণ্যের শুরুতেই রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে শিহরিত করতো। তিনি জীবনকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন ভিন্নমাত্রায়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাবার বদলির সুবাদে চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মোসলেম হাই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেছেন এবিএম মূসা। ১৯৪৫ সালে তাঁর বাবা আবার নোয়াখালী ফিরে এলে নোয়াখালী জেলা স্কুল ভর্তি হন তিনি। ১৯৪৬ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

কলেজ জীবন থেকেই এবিএম মূসা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। চৌমুহনী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে তিনি *কৈফিয়ত* নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এছাড়া ফেনীতে খাজা আহমদের সাপ্তাহিক *সংগ্রাম*-এও নিয়মিত লিখতেন। এরপর বিএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে ঢাকায় এসে তিনি *ইনসাফ* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। পেশাগত সাংবাদিকতার শুরুর দিকে এক দল সাংবাদিক বের হয়ে আসেন, তাদের অনেকে যোগ দেন *ইনসাফ* পত্রিকায়। এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন কে.জি. মুস্তাফা। এই *ইনসাফ* পত্রিকায় তিন মাস কাজ করার পর এবিএম মূসা শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে ১৯৫০ সালের নভেম্বরে *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দেন। অ্যাডভোকেট শেহাবুদ্দিন আহমদ তখন *অবজারভার*-এর নামমাত্র সম্পাদক, মূল কাজ করতেন আবদুস সালাম। সৈয়দ নূরুদ্দীন তখন *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছাপার কারণে *পাকিস্ড়ন অবজারভার* বন্ধ হয়ে গেলে এবিএম মূসা দৈনিক *সংবাদ*-এ যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে আবার *অবজারভার* প্রকাশিত হলে সেখানে তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটের বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনে যান। অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউজে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপে ামা করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি *অবজারভার*-এর সনাতনী চেহারা বদলে দেন। সেখানে যুক্ত করেন নতুন বিষয় ও নবতর অঙ্গসজ্জা। ১৯৭১ সাল পর্যন্ড় তিনি *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন। বার্তা সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তাই *পাকিস্ড়ন অবজারভার*কে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্ড়নের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্ড়ন ও বহির্বিশ্ব বাঙালির মনের কথা জানতে পারতো *পাকিস্ড়ন অবজারভার* পড়ে। ৬০-এর দশক এবিএম মূসা বাংলাদেশের পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি ইকোনমিস্ট*সহ বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমের বাংলাদশ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। *লন্ডন টাইমস*-এর প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্সের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুর— হলে হ্যারল্ড ইভান্সের উদ্যোগ এবিএম মূসা হংকঙে যান। আবার হ্যারল্ড ইভান্সের পরামর্শ মোতাবেকেই সেখান থেকে মুজিবনগরে গিয়ে যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করে বিদেশি গণমাধ্যমে পাঠাতেন। হংকংভিত্তিক বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে এবিএম মূসা ভারত থেকে যুদ্ধের খবর *বিবিসি*কে জানাতেন। কেননা একাত্তরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ড় ভারতে *বিবিসি*র কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে শেষে দেশে ফিরে আর কোন পত্রিকায় যোগ দেননি এবিএম মূসা। এ সময়ে তিনি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর তিনি *বাংলাদেশ টেলিভিশন*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পান। এর কিছুদিন পর তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে এবিএম মূসা আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাে ের পর তিনি আবার লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি *সানডে টাইমস* পত্রিকার রিসার্চ ফেলোর কাজ পান। বিদেশে তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ড় ইউএসইপির আঞ্চলিক তথ্য পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক এবং তারপর বার্তা সংস্থা *বাসস*-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচলক পদে কাজ করেন।

*প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমানের অনুরোধ ও উৎসাহে এবিএম মূসা কলামিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৯৫ সালের ১৮ মার্চ *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর প্রথম

কলাম 'আবদুল গাফফার চৌধুরী বন্ধুবরেষু' ছাপা হয়। এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক *কুরিয়ার*-এও তিনি দুই বছর লিখেছেন। ১৯৯১ সালে *নিউজ ডে* নামে একটি ইংরেজি দৈনিকে সম্পাদক হিসেবে বছর খানেক কাজ করেন। ২০০৪ সালে কিছুদিন তিনি দৈনিক *যুগান্ড়র*-এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

এবিএম মূসা পাকিস্ড়নের সাংবাদিকদের ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। প্রয়াত এসএম আলী যখন ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পাকিস্ড়ন জার্নালিস্টস ওয়েজ বোর্ডের সদস্য, এবিএম মূসা তখন ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্ড়ন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে সময়েই প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর হয়।

১৯৬৫ সালে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্ড়ন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চুক্তি সম্পাদন করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্ন কারণে এবিএম মূসা আন্ড়র্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুস সালামের বড় জামাতা। তাঁর স্ত্রী সেতারা মূসা, মেয়ে পারভিন সুলতানা ঝুমা প্রত্যেকেই সাংবাদিকতা পেশায় পরিচিত নাম। ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা পরলোকগমন করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ (বিএসএস, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ)

আনন্দ কুমার শীল

দুলাল সমাদ্দার

ফাহিমা আহমেদ কচি

ফারজানা আকতার

শরিফুল ইসলাম

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫'

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক; উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক মফিজুর রহমান; চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপ্রধান: অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আজীবন সম্মাননা: তোয়াব খান।

স্মারক বক্তা: অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০১৫।

স্থান: অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আয়োজক: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।